Vol. 52 | No. 2 | 2015

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

কিত্তনখোলা : 'ইউরোপীয় নাট্যরীতির উল্টা পথযাত্রা'

Volume	52
Issue	2
Year	2015
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Qudrat-E-Huda
Published online	February 1, 2015
DOI	10.62328/sp.v52i2.11
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v52i2.11
Pages	১৮৯-১৯৯
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

কিত্তনখোলা: 'ইউরোপীয় নাট্যরীতির উল্টা পথযাত্রা'

Check for updates

মোহাম্মদ কুদরত-ই-হুদা*

আধুনিক বাংলা নাটকের ইতিহাসের বয়স দেড়শ বছরের মতো। এই দেড়শ বছরের বাংলা নাটকের জগৎ নিঃসন্দেহে বহুবর্ণিল এবং সমৃদ্ধ। ইতিহাসের এই দীর্ঘ পরিক্রমায় নানা নিরীক্ষা, অনুকরণ-অনুসরণ, স্বকীয়তা আর মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন নানা নাট্যকার। এই সময় পরিসরে বাংলা নাটকে ঘটেছে বিচিত্র পালাবদল। মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩), গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২), মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩), নূরুল মোমেন (১৯০৬-১৯৮৯), শম্ভু মিত্র (১৯১৫-১৯৯৭), বিজন ভট্টাচার্য (১৯১৭-১৯৭৮), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১), উৎপল দত্ত (১৯২৯-১৯৯৪), সাঈদ আহমদ (১৯৩১-২০১০)-সহ আরো বহু নাট্যকারের প্রযত্ন-প্রচেষ্টা আর সৃজনশীলতায় ঋদ্ধ হয়েছে বাংলা নাটকের পাটাতন আর পরবর্তী জমিন। বাংলা নাটকের এই ধারাবাহিক ইতিহাসের মধ্যে সেলিম আল দীন (১৯৪৯-২০০৮)-কে তাঁর নাটকের বিষয়, আঙ্গিক আর শিল্পরীতির স্বাতন্ত্র্যের কারণে সহজেই আলাদা করে চেনা যায়। সেলিম আল দীন তাঁর নাট্য-প্রতিভার মূল প্রবণতা অনুযায়ী দেড়শ বছর ধরে গড়ে ওঠা 'আধুনিক' বাংলা নাটকের প্রথাকে দুমড়ে-মুচড়ে, ভেঙে-চুরে ফেলেছেন। প্রথাগত পাশ্চাত্য নাট্যরীতিকে তিনি প্রায় অগ্রাহ্য করে, দেশজ শিল্পরীতিকে গ্রহণ করেছেন। নাটকের আঙ্গিক ও শিল্পরীতির বিচারে তিনি ঔপনিবেশিকতার মাদকমুক্ত। আঙ্গিক ও শিল্পরীতির প্রশ্নে ঔপনিবেশিকতার দাসত্বের জোয়াল ঝেড়ে ফেলেই সেলিম আল দীন আধুনিক বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে অনন্য হয়ে উঠেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধের প্রথম অংশে বাংলা নাটকের উৎস ও গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা এবং এ বিষয়ে সেলিম আল দীনের মতামত সংক্ষিপ্তভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য, সেলিম আল দীনের নাট্য-প্রবণতা ও অবস্থান স্পষ্ট করা। কারণ ইতিহাস, ইতিহাসের মূল্যায়ন ও ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব-মিলনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন ছাড়া সেলিম আল দীনের বিশেষত্ব এবং বাংলা নাটকে তাঁর অবদান স্পষ্ট হবে না। প্রবন্ধের প্রথম অংশে স্পষ্টীকৃত সেলিম আল দীনের নাট্যচিন্তা ও অবস্থানের ভিত্তিতে দ্বিতীয় অংশে তাঁর মৌল প্রবণতার প্রতিনিধিত্বমূলক নাটক *কিত্তনখোলা* (১৯৮৬)-র আঙ্গিক ও শিল্পরীতির বিশেষত্ব দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

এক

বাংলা নাটকের উদ্ভব নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বেশ চিত্তাকর্ষক মতভেদ রয়েছে। বাংলা নাটকের উদ্ভব ও ধারাবাহিক ইতিহাস-বিষয়ক আকর গ্রন্থ অজিতকুমার ঘোষ প্রণীত *বাংলা নাটকের ইতিহাস*। উক্ত গ্রন্থে তিনি দাবি করেছেন, বাংলায় মুসলমানদের আগমনের পূর্বে সংস্কৃত

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শ্রীনগর সরকারি কলেজ, মুন্সিগঞ্জ।

নাটকের প্রচলন ছিল। এ নাটকগুলি জনবিচ্ছিন্ন হলেও রাজ-রাজড়া ও রাজপ্রাসাদ সংশ্লিষ্ট দর্শকদের মধ্যে তা অভিনীত হতো। কিন্তু মুসলমান আগমনের ফলে 'সেই রাজাদের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে নাটকেরও স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে।' (অজিতকুমার, ২০০৫ : ৩) এরপর মধ্যযুগে নাটকের স্থান দখল করে যাত্রা। তাঁর ভাষায়, 'সংস্কৃত নাটকের মধ্যেও দেশের সর্বসাধারণ নিজেদের যে প্রাণের প্রতিধ্বনি শুনিতে পান নাই, এতদিন পরে সেই রাজসম্মান-বঞ্চিত ধূলামাটি চর্চিত যাত্রার মধ্যে তাহা শুনিতে পাইল। উন্মত্ত আগ্রহে তাহারা ইহা বরণ করিয়া লইল।' (অজিতকুমার, ২০০৫ : ৪) মধ্যযুগে মঙ্গলগান, লোকসঙ্গীত, শিবোৎসব, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, পালাগান, জগন্নাথদেবের রথযাত্রা ইত্যাদি উৎস থেকে যাত্রা তার রসদ সংগ্রহ করেছে বলে মত দিয়েছেন অজিতকুমার। সমগ্র মধ্যযুগ ব্যাপী 'নাট্যভারতীর মুখশ্রী অন্ধকারে অবগুণ্ঠিত' থাকার পর 'তাহাই পুনরায় জ্বলিয়া উঠিল' অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে (১৭৯৫) হেরেসিম লেবেদেফ্ (১৭৪৯-১৮১৮) নামক এক রুশদেশবাসী বিদেশির পৌরোহিত্যে। (অজিতকুমার, ২০০৫ : ১৩) স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, অজিতকুমার মধ্যযুগকে নাটকহীন সময় মনে করেন এবং 'আধুনিক' বাংলা নাটকের ইতিহাসকে প্রকারান্তরে উপনিবেশের ইতিহাসের সমান্তরাল মনে করেন। শুধু অজিতকুমার নন, মূলধারার নাট্য ইতিহাসকারদের প্রায় সবাই এটি মনে করেন। উদাহরণ হিসেবে আরো অনেকের সঙ্গে সুকুমার সেনের নামও উল্লেখ করা যায়, যিনি মনে করেন, ' সংস্কৃত ও ইংরেজী নাট্যগ্রন্থের অনুকরণে ও অনুসরণে বাঙ্গালা নাটকের সৃষ্টি'। (সুকুমার, ১৪০১ : ৩১২)

কিন্তু বাংলা নাটকের উদ্ভব ও এর প্রকৃতি নিয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন সেলিম আল দীন। তিনি মনে করেন, বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে নাটকের অস্তিত্ব ছিল। তিনি ১৩৫০-এ লেখা *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এর মধ্যে একটা নাটকের সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যই খুঁজে পান। (সেলিম, ২০০৬ : ৩৩৫) বাংলা নাটকের উৎস খুঁজতে গিয়ে তিনি শুধু মধ্যযুগ নয়, আরো পূর্বে যাওয়ার পক্ষপাতী। তিনি বাংলা নাটকের আদি রূপ হিসেবে 'ওড্রমাগধী'-র উল্লেখ করেছেন। তাঁর দাবি, ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত 'ওড্রমাগধী রীতি'র নাটকই বাংলা নাটকের আদি উৎস। এই রীতির নাটকের বিস্তারিত কোনো তথ্য আমাদের হাতে না আসার কারণ হিসেবে সেলিম বলেছেন, এগুলো অনার্যদের দ্বারা রচিত হতো, এগুলো লোকজ স্তরে চালু ছিল এবং মুখে মুখে রচিত হতো। মধ্যযুগের যাবতীয় সাহিত্যকে সেলিম আল দীন (২০০৬) ওই 'ওড্রোমাগধী রীতি'-র নাটকের ক্রমবিকাশের ফল বলে মনে করেন। স্পষ্টত বোঝা যায়, নাট্যতাত্ত্বিক ও নাটকের ইতিহাসকার হিসেবে সেলিম আল দীন বাংলা নাটকের এক নিজস্ব ধারাবাহিক ইতিহাস নির্মাণের পক্ষপাতী। ইংরেজ উপনিবেশের ফলে বাংলা নাটকের যে বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়েছে, সেই ছিন্ন সূত্রের সূত্রধর সেলিম আল দীন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন —

> আমরা মূলত উনিশ শতকে ইউরোপ প্রভাবিত শহুরে নাটকের যে ধারা বাংলা নাটকে সৃষ্টি হয়েছিল সে সম্পর্কে কম উৎসাহী। আমাদের ঢাকা থিয়েটার আদি ও মধ্যযুগের বাংলা নাটকের গঠন স্বরূপটি আবিষ্কার করতে চায়। (সেলিম, ২০০৬ : ৩৩৪)

সেলিম আল দীনের এই তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক অবস্থানের সঙ্গে তাঁর প্রধান ধারার প্রতিনিধিত্বস্থানীয় নাটকের রীতির কোনো তফাৎ নেই। *মুনতাসির, শকুন্তলা, কিত্তনখোলা*

(১৯৮৬), *কেরামতমঙ্গল* (১৯৮৮) *যৈবতী কন্যার মন* (১৯৯৩), *হাতহদাই* (১৯৯৭), *প্রাচ্য* (২০০০) ইত্যাদি মূলধারার নাটকগুলো সেলিম আল দীনের ইউরোপীয় নাট্যরীতির বিপরীতে খাঁটি দেশজ নাট্যরীতির দৃষ্টান্ত।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঔপনিবেশিকতার সাধারণ সূত্র অনুযায়ী, ইংরেজ ঔপনিবেশিক শক্তির হাত ধরে বাংলায় নানা কিছুর আমদানি ঘটেছে । উপনিবেশকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সে নিজেকে 'মহৎ', 'উন্নত' আর 'আদর্শ' হিসেবে দেখে এবং দেখতে চায়। আধিপত্য, প্রভাব, শাসন আর শোষণ জারি রাখতে যেকোনো ঔপনিবেশিক শক্তির জন্য এই 'মহৎ', 'উন্নত' আর 'আদর্শ'-এর ধারণা প্রতিষ্ঠিত করা খুবই জরুরি হয়ে পড়ে। এই প্রতিষ্ঠায়নের ঘটনাটি ঘটে ঔপনিবেশিক শক্তির চেতনার রঙে রাঙানো শিক্ষা এবং সেই শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণির দ্বারা। স্বভাবতই তারা তাদের অতীত ও বর্তমানকে এবং যা কিছু 'নিজ', তাকে আবিষ্কার করে 'অনুন্নত' হিসেবে। ইংরেজ উপনিবেশ শুরুর কিছুকালের মধ্যেই এই চেতনা শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে দেখা দিয়েছিল। 'ভারতবর্ষীয়রা হীন, তাই তাদের পরশাসন দরকার — এই বোধ কলকাতার ভদ্রলোকদের মনে উনিশ শতকের গোড়া থেকেই জেঁকে বসে গেছে।' (আজম, ২০১৪ : ৮৯) এরূপ চেতনায় উপনিবেশিত শ্রেণির মাপকাঠি হয়ে ওঠে নতুন রুচি আর আদর্শ। সেই নতুন রুচি আদর্শ দিয়ে সে যখন তার নিজের জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প-সাহিত্যকে মাপতে যায়, তখন তার স্থান হয় তলানিতে। ফলে এই নব্য শ্রেণি দ্বারা ক্রমে পরিত্যক্ত হতে থাকে তার নিজস্ব দেশজ শিল্পসাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানের দীর্ঘকালের চর্চার ইতিহাস। সে এগুলোকে অভিহিত করতে থাকে 'পশ্চাৎপদ' এবং 'মধ্যযুগীয়' বলে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে উপনিবেশিত বাংলায় স্বভাবতই এই ঘটনাটি ঘটেছে। বাংলায় আমদানিকৃত ঔপনিবেশিক রুচি, চিন্তা, শিল্পসাহিত্যের ধারণার নিচে চাপা পড়ে গিয়েছে বাংলার প্রায় হাজার বছরের ক্রমবিকাশমান শিল্পসাহিত্যের ধারা এবং ধারণা। ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণি শুনতে, শিখতে এবং মানতে শুরু করেছে যে, 'শেক্সপিয়র সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার'। খুবই অদূরদর্শী, অযৌক্তিক এবং আধিপত্যবাদী এই উক্তি ও ধারণা সেদিন বিনা বাক্য ব্যয়ে মানিত হয়েছে। সাথে সাথে শেক্সপিয়র হয়ে উঠেছেন নাট্যচর্চার 'আদর্শ'। ফলে, বাংলা নাটকের ইতিহাসের হাল ঘুরে গিয়েছে ইউরোপের অভিমুখে। ইউরোপ বাংলা নাটকের কেবলায় পরিণত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বাংলা ভাষায় উৎপাদিত নাটকসমূহ জীবনচেতনায় এবং শিল্পরীতিতে হয়ে উঠেছে ইউরোপীয়। কাহিনির প্রকাশরীতি, দৃশ্যসজ্জা, মঞ্চ পরিকল্পনা, অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাজন এবং চরিত্রায়ণের যে দেশীয় রীতি দীর্ঘ চর্চার ভেতর দিয়ে বিকাশমান ছিল, তার পরিবর্তে গৃহীত হল পাশ্চাত্য রীতি।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই পাশ্চাত্য রীতির সবচেয়ে মেধাবী আর জনক নাট্যপুরুষ। তাঁর পূর্বের নাটক ছিল হয় সংস্কৃতের অনুবাদ, নতুবা সংস্কৃত নাটকের অনুকরণ। মাইকেল প্রথম 'পাশ্চাত্ত্য নাটসাহিত্যের প্রথায়' নাটক রচনা করেন। (অজিতকুমার, ২০০৫ : ৬৮)। মাইকেলের *শর্মিষ্ঠা* (১৮৫৯) রচনার মধ্য দিয়ে বাংলা নাটক ইউরোপীয় নাট্যরীতিতে যে প্রবেশ করল, এর পরের দেড়শ বছরের বাংলা নাটক দু-একটা ব্যতিক্রম ছাড়া অন্তর্গতভাবে সেই পথেই হেঁটেছে।

মাইকেলের পরের বাংলা নাটকের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, আঙ্গিক ও নাট্যরীতির প্রশ্নে প্রায় সবাই পাশ্চাত্যমুখী, আর চেতনার প্রশ্নে হয় সামাজিক সমস্যা-সংশ্লিষ্ট, নতুবা জাতীয়তাবাদ অথবা রাজনীতি-ঘনিষ্ঠ। বিষয় যা-ই হোক না কেন, নাটকের শিল্পরীতির খুব একটা হেরফের হয়নি। এমনকি বাংলা নাটক কোনো দার্শনিক বোঝাপড়ার মধ্যেও যায়নি। মঞ্চের বাইরে গ্রন্থ আকারে পঠিত হতে পারে এমন নাটকও বাংলা সাহিত্যে খুব একটা দেখা যায়নি। একথা মনে রেখেই বলছি যে, 'নাট্যকার কর্তৃক নাটক লিখিত ও প্রকাশিত হলেই, এবং তারপর পাঠকের হাতে পৌঁছে গেলেই, তা পূর্ণত্ব পায় না। মঞ্চে অভিনীত হয়ে দর্শককুলের সামনে পরিবেশিত হবার পরই নাটক তার যথার্থ পূর্ণত্ব লাভ করে।' (কবীর, ১৯৮৮ : ৩৫) কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাটকের কথা মাথায় রাখলে একথার ধ্রুবত্ব প্রশ্নবিদ্ধ হতে বাধ্য। কারণ, রবীন্দ্রনাথের নাটক মঞ্চের বাইরেও তার দার্শনিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারণে মঞ্চ ছাড়াই সার্বভৌম পাঠের সুযোগ করে দিয়ে অনন্যতা অর্জন করেছে। বাংলা নাটকের উপর্যুক্ত দুর্বলতা আর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সেলিম আল দীন ছিলেন সম্পূর্ণ সচেতন। বিভিন্ন লেখা এবং বক্তৃতায় তাঁর এই বোঝাপড়ার স্বাক্ষর রয়েছে। '... বাঙলা নাটকের আঙ্গিকগত সীমাবদ্ধতা আর বিষয়দৈন্যের বিরুদ্ধে একটা লড়াই' সব সময় সেলিম আল দীনের মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল। তিনি বাংলা নাটকের 'বিস্তারটা মঙ্গলকাব্যের মতো' বা 'উপন্যাসের সীমা' পর্যন্ত নেয়ার সাধনা করেছেন। তিনি সমকালীন কলকাতার নাটক সম্পর্কে যেকথা বলেছেন — 'সমাজ সংস্কারের ও রাজনৈতিক বক্তব্যে ঠাঁসা' — একথা মূলত প্রায় সমগ্র বাংলা নাটক সম্পর্কেই খাটে। তিনি বাংলাদেশের নাটকের প্রবণতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন —

> আমাদের নাটক ঊনবিংশ শতাব্দীর বাস্তববাদী ঘরনার খোলস ছেড়ে কৃচিৎ বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে প্রকৃত আধুনিকতার পথে। এবং ৭২ সালের পর থেকে আজকের এই উৎসব পর্যন্ত বাঙলা নাটকের সেই ধাঁচটি নিশ্চিত ভবিতব্যরূপে যেনবা অপেক্ষমান।' (সেলিম, ২০০৬ : ৩৪৫)

বাংলা নাটকের সীমাবদ্ধতা এবং এর উত্তরণের উপায় সম্পর্কে তিনি বলেছেন —

> একবার মনে করুন — আপনারা তাদেরই আধুনিক মনে করছেন — যারা আত্মপ্রতারক যারা — ব্রেখটীয় নাটকের প্রতারণায় মত্ত। সমাজ সংস্কার তারাই নাটকের ভিতর দিয়ে করতে চায়– যারা– উন্মূল বুর্জোয়া শিল্পকাণ্ডজ্ঞানহীন সমাজের একাংশ। এরা সময় সুযোগে– শেকসপীয়র খায়– আর সুযোগ পেলে ব্রেখটও পান করতে ইতস্তত করে না। এরা সামাজিক সমস্যাকে– বস্তাপচা আঙ্গিকে পরিবেশন করে — আপনারা ভাবেন — এইতো আধুনিকতা। এই মুহূর্তে আমাদের কর্তব্য কী। আমাদের ধারণা মৌলিক নাটকের নতুন উদ্ভাবনার পথেই বাঙলা নাটকের মুক্তি। ... জীবনকে বাঁধা ফর্মূলায় যে সব নাট্যকার বাঁধতে চান — কিংবা চিরকাল — নাটকে যা জনপ্রিয়– যে মূল্যবোধ এ যুগে কেবল নাট্য-প্রথায় সীমাবদ্ধ — সে ধরনের নাটক বর্জন করতে হবে। (সেলিম, ২০০৬ : ৩৪৭-৩৪৮)

তবে বাংলা নাটকের বিষয় আর রীতির ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে মৌলিকতায় ভাস্বর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধানত ঔপনিবেশিক সাহিত্য চেতনার উৎকৃষ্ট প্রকাশ হওয়া সত্ত্বেও যেসব ক্ষেত্রে তিনি ঔপনিবেশিকতার বেড়াজাল ছিন্ন করতে পেরেছিলেন, তার মধ্যে

নাটক অন্যতম। নাটকে তিনি ঔপনিবেশিক অর্থাৎ ইউরোপীয় নাট্যরীতির বাইরে গিয়ে দেশজ ধারার অনুবর্তী থেকেছেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে। নাটকে গানের ব্যবহার এরকম একটি ক্ষেত্র। সেলিম আল দীন নাটকে ব্যবহৃত গানে শুধু সঙ্গীতস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথকে দেখেননি, সেখানে তিনি জাতীয় নাট্য আঙ্গিকের স্রষ্টা এক পিতৃপ্রতিম দার্শনিককেও দেখেছেন। (সেলিম, ২০০৬ : ৩৩৫) বাংলা নাটকের পালাবদলের ইতিহাসে সমালোচকগণ মধুসূদন এবং রবীন্দ্রনাথকেই দুই ধারার দুই নিয়ামক মনে করেন। এই দুই মহীরুহের মাঝের নাট্যকারদের সম্পর্কে বলা হয়, 'ইতিহাসের শূন্যস্থান পূরণে তাঁদেরও একটা ভূমিকা রয়েছে। ইতিহাসের অংশ তাঁরা স্বতন্ত্র কোনো অধ্যায় নয়। ইতিহাসের জনক মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাকিরা উক্ত দুই মহাজনের সংযোগসেতু।' (লুৎফর, ২০১২ : ২৭) আর রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা নাটকের আরেক পালাবদল সেলিম আল দীন বলে অনেকে মনে করেন। কারণ 'সত্যি সত্যি সেলিম আল দীনের সৃষ্টির অভ্যন্তরে নতুন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা ইতিহাসের বিশেষ একটা বাঁক পরিবর্তনের স্মারক।' (লুৎফর, ২০১২ : ২৭-২৮) সেলিম আল দীন বাংলা নাটকের শিল্পরীতি এবং আঙ্গিকের বি-উনিবেশায়ন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বাংলাদেশের নাটকে তো বটেই, এমন কি সমগ্র বাংলা নাটকের ইতিহাসে তাঁর মতো দেশজ ধারার নাট্যপ্রতিভা বিরল। এই আলোকেই তাঁর *কিত্তনখোলা* নাটকের আঙ্গিক ও শিল্পরীতি বিচার্য, যাকে প্রবন্ধ শিরোনামে আমরা বলেছি 'ইউরোপীয় নাট্যধারার উল্টা পথযাত্রা'। *কিত্তনখোলা* নাটকটি শুধু বহিরঙ্গে নয় অন্তরঙ্গেও প্রবলভাবে ঔপনিবেশিক নাট্য-শিল্পরীতির বাইরে থাকতে পেরেছে।

দুই

কিত্তনখোলা নাটকের বিষয় গ্রামীণ জীবন ও সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান গ্রাম্য মেলা। এই মেলায় গ্রামীণ বিচিত্র সুর ও স্বর, শ্রেণি ও অবস্থান, রুচি ও প্রবণতা, ভাব ও চেতনাধারী মানুষের যে সমাগম ঘটে, সেই সমাগম এবং তাদের পারফরমেন্সই *কিত্তনখোলা* নাটকের বিষয়। কিন্তু এই বিষয়ের ভেতরে লুকিয়ে থাকা বস্তু কিন্তু ভিন্ন। এই নাটকের বিষয়বস্তু হচ্ছে 'রূপান্তর'। বৃহত্তর অর্থে ধরতে গেলে জগতের রূপান্তর সত্যকে উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে নাটকটিতে। অর্থাৎ সেলিম আল দীন দেখাতে চেয়েছেন যে, জগৎ রূপান্তরশীল। নাট্যকারের ভাষায় —

> আইজ যে কইবাম রূপ বদলের কথা
> পশু পক্ষী মানুষ আদি ঋতু তরুলতা।
> ছয় ঋতু রূপান্তর হয় বারো মাসে
> সেই মতো মানুষেরও রূপ পরকাশে।
> অদল বদল হয় তামাম দুনিয়া
> নানা মতে নানা রূপে দেখো বিচারিয়া। (সেলিম, ২০০৬ : ৮০)

নাট্যকার জগতের সার্বিক রূপন্তরের কথা বললেও, শিল্প মাধ্যম হিসেবে নাটক যেহেতু মূলগতভাবে মানুষের ক্রিয়া-কর্ম-উচ্চারণে উচ্চকিত, সেহেতু এখানে মানব জীবনের রূপান্তরশীলতার কথাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। নানা ঘাত-প্রতিঘাত, ঘটনা-প্রতিঘটনা, সংকট-

সম্ভাবনা, বাস্তবতা-পারিপার্শ্বিকতার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ অন্তর্গত এবং বাহ্যিকভাবে রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তর অনাকাঙ্ক্ষিত হলেও অনিবার্য। ফলে রূপান্তর কখনো হাহাকারের, বেদনার, কখনো সফলতার, আনন্দের। *কিত্তনখোলা* নাটকে সেলিম আল দীন মানুষ এবং মানবজীবনের বহুমাত্রিক রূপান্তরের সত্যকে পর্যবেক্ষণ এবং আবিষ্কার করেছেন।

খুব সহজেই প্রশ্ন উঠতে পারে, পৃথিবী এবং বিশেষত মানব জীবনের এই 'অদল বদল'-এর সত্য সেলিম আল দীনের কোনো মৌলিক পর্যবেক্ষণ কি না। সাধারণ দৃষ্টি দিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, রূপান্তরের এই সত্য তাঁর নতুন আবিষ্কার বা পর্যবেক্ষণ নয়। সেলিম আল দীন নিজেও তা বলেছেন —

> পূর্বেতে এই কিসস্না কইছে অনেক মহাজন
> সেই কিসসা কইবাম আমি সত্য ভাবি মন।
> এই কিসসা আইজ আছে– রইব ভবিষ্যতে
> নানা ছন্দে নানা রীতে রইব নানা মতে। (সেলিম, ২০০৬ : ৮০)

সর্বসাধারণের জ্ঞাত, 'নানা ছন্দে নানা রীতে' চর্চিত একটা সত্যকে সেলিম আল দীন তাঁর *কিত্তনখোলা* নাটকে যে ধারণ করলেন, এখানে তাঁর কৃতিত্ব, বিশেষত্ব কোথায়? সেলিম আল দীনের কৃতিত্ব হচ্ছে, তিনি পুরাতন এবং চিরন্তন একটি দার্শনিক সত্যকে নতুন আবিষ্কারের মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। বিশেষ এক শ্রেণির মানুষের বিশেষ এক ধরনের জীবন সংগ্রামের মধ্যে নাট্যকার এই চিরায়ত সত্যকে যখন বিশেষ রসমূর্তি দান করেন, তখন সার্বিক হয়েও তা হয়ে ওঠে বিশেষ এবং নতুন। নাটক পাঠ শেষে পাঠক সার্বভৌম, অন্য নিরপেক্ষ আবিষ্কারের এবং বোধের আনন্দে উদ্বেলিত এবং স্তম্ভিত হয়। মহৎ সাহিত্যকর্মের চরিত্রই এমন যে, তা পুরাতন সত্যকে নতুন পরিপ্রেক্ষিত এবং বাস্তবতার মধ্যে নতুনভাবে আবিষ্কার করে এবং পাঠককে অনাস্বাদিতপূর্ব বোধের স্তরে নিয়ে যায়। সেলিম আল দীনের *কিত্তনখোলা* নাটকের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে।

কিত্তনখোলা নাটকের বিষয় এমন এক দার্শনিক প্রত্যয়ে সমৃদ্ধ যে, নাটকটির মঞ্চ-নিরপেক্ষ পাঠ সম্ভব। বাংলা নাটকে মঞ্চ-নিরপেক্ষ স্বাধীন পাঠযোগ্য নাটকের যে অভাবের কথা আমরা ইতঃপূর্বে বলেছি, সেই অভাব সেলিম আল দীন অনেকখানি পূরণ করেছেন। এর কারণ বোধ করি সেলিম আল দীনের নাটকের বিষয়-স্বাতন্ত্র্য, ব্যাপ্তি, দার্শনিক গভীরতা, অনুভববেদ্যতা এবং সার্বভৌমিকতা। বাংলা নাটকের এই বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের নাটকেও লক্ষ করা যায়। *কিত্তনখোলা* নাটকের বিষয়-গৌরবের কারণেই পাঠকের পক্ষে নাটকটির মঞ্চ-নিরপেক্ষ রস আস্বাদন সম্ভব। এটি নাটকটিকে এক দুর্লভ মর্যাদা এনে দিয়েছে। এটি সম্ভব হয়েছে নাটককে প্রথাগতভাবে 'সমাজ সংস্কার', 'সামাজিক সমস্যা', 'রাজনৈতিক সমস্যায়' ভারাক্রান্ত করে না তোলার কারণেও।

সেলিম আল দীনের *কিত্তনখোলা* নাটকের বিষয়বস্তুর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, তিনি রূপান্তর বিষয়টিকে প্রথাগত সাহিত্যের বিষয়ের মতো করে দেখেননি। প্রথাগত সাহিত্যে যে রূপান্তর দেখানো হয়, তা সাধারণত সামাজিক এবং অর্থনৈতিক রূপান্তরের

মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। যেমন, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১)-এর অধিকাংশ উপন্যাসে এই রূপান্তরের বাস্তবতা অত্যন্ত নিখুঁত, মানবিক এবং শিল্পসম্মতভাবে চিত্রিত হয়েছে। তারাশঙ্করের পরে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনের মানবিক শিল্পমূর্তি নির্মাণ বাংলা সাহিত্যে প্রায় এক সিদ্ধরসে পরিণত হয়। কিন্তু সেলিম আল দীন উত্তরকালের শিল্পী হিসেবে এই সীমিত রূপান্তর বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তিনি দাবিও করেছেন যে, 'রূপান্তরের সামাজিক পর্ব রচনার একমাত্র প্রবণতাকে আমি এড়াতে পেরেছি বলে আমার বিশ্বাস।' (সেলিম, ২০০৬ : ৩৩৮) সামাজিক, পেশাগত আর অর্থনৈতিক রূপান্তরও এ-নাটকে আছে। এমন কি এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র সোনাই, যার 'দাদার বাপ আছিল জোলা — পাবনার কৈজুরী গেরামে। ... দাদার নাম রইসুদ্দি — চাষের কাম করত'; তার নিজেরও পেশাগত রূপান্তর হয়েছে। সে হয়েছে দিনমজুর। আর নাটকের শেষে দেখা যায় সে 'হাপ ধরা ... ঝাড়ফুঁক তন্তরমন্তর' শিখে নতুন পেশার জন্য মনস্থির করেছে। কিন্তু এই রূপান্তরকে নাট্যকার দেখিয়েছেন জীবনের সামগ্রিক রূপান্তরের অংশ হিসেবেই। এই যে রূপান্তর, এই রূপান্তর নিয়ে সোনাই এবং নাট্যকার কারো মধ্যেই কোনো প্রথাগত হাহকার নেই। 'রূপান্তরের এই প্রক্রিয়াকে অনিবার্য ও অপ্রতিরোধ্য বলে মনে হয় সোনাইর।' (সেলিম, ২০০৬ : ১৬৮) এখানেই জীবন চেতনায় সেলিম আল দীনের গভীরতা, দার্শনিকোচিত নির্মোহতা। তবে *কিত্তনখোলা* নাটকে নাট্যকারের মূল উদ্দেশ্য এই পেশাগত, সামাজিক বা অর্থনৈতিক দিক থেকে সীমাবদ্ধ রূপান্তর দেখানো নয়। তাঁর উদ্দেশ্য মানব জীবন যে রূপান্তরশীল এই সত্য উদঘাটন করা। এটি তিনি স্পষ্ট করেছেন বনশ্রীর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে মরে যাওয়া বনশ্রী সম্পর্কে সোনাইয়ের নিম্নোক্ত ভাবনাটি —

> সোনাই ভাবে — তাড়ির দোকানের পেছনের সেই বনে বনশ্রীর কালো সুডৌল শরীর পোড়া ছাইয়ের ভেতর থেকে আগামী আষাঢ় — ভদ্র — পৌষ — মাঘ পেরিয়ে — সকলের অগোচরে কোনো নিঃসঙ্গ তালের আঁটি থেকে কি জন্ম নেবে একটি তাল গাছ — নারী ও ফলবান। ছড়ি নামব। লাল ঠিলার রসে নেশা হবো আরেক ছায়ারঞ্জনের — আরেক সোনাইর। (সেলিম, ২০০৬ : ১৬৮)

সোনাই নিজে উপলব্ধি করে আরো বলেছে 'এক জনমে জরম হয় অনেকবার।' অথবা নাটকের চরিত্র শামছল বয়াতি যেমনটি সোনাইকে বলেছে, 'এ হইতাছে রূপ বদলের লড়াই বাবা। এক রূপ চিরদিন থাকে না।'

অ্যারিস্টটলের *Poetics* গ্রন্থসূত্রে আমরা জানি যে, নাটক ক্রিয়াত্মক শিল্প, আর মহাকাব্য বর্ণনাত্মক শিল্প। আধুনিক যুগে বর্ণনাত্মক শিল্প হিসেবে মহাকাব্যের জায়গা দখল করেছে উপন্যাস। শুধু তাই নয়, উপন্যাসকে বলা হয় সর্ব সাহিত্য শাখার এক সমবায়ী শিল্প । কিন্তু নাটক শিল্পশাখা হিসেবে উপন্যাস বা মহাকাব্যের মতো এত স্থিতিস্থাপক নয়। নাটকের পশ্চিমী ধরন-ধারণ মোতাবেক, এর সীমাবদ্ধতা অথবা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, নাট্যকার এখানে দৃশ্যমান নন। তিনি দর্শক এবং পাত্র-পাত্রী থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন। তবে আড়ালে থেকে অদৃশ্য ঈশ্বরের মতো ছড়ি ঘোরান চরিত্রদের কর্মকাণ্ডে এবং ঘটনাপ্রবাহে। তাঁর অদৃশ্য চেতনার উপস্থিতিতে নাটকের সবকিছু প্রবলভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

কাহিনি লাভ করে এক সুডৌল নিটোল রূপ। তবে এই কাহিনি গড়ে তোলার মধ্যে নাট্যকারের বর্ণনা দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। নাটক সম্পর্কে এ ধারণা আমরা লাভ করেছি ইউরোপের মাধ্যমে। কিন্তু বাংলা নাটক ভিন্ন কথা বলে। সেলিম আল দীনের ভাষায় —

> আমরা বাংলা নাটকের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটা জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি যে — বাংলা নাটকে বর্ণনাধর্মিতা ও সংলাপমুখীনতা পরস্পরের পরিপূরক। অথচ ইউরোপীয় সংজ্ঞায় উৎকৃষ্ট নাটকে এটা হবে নিতান্ত দোষাবহ। এই জন্যই বোধ হয় বাংলা নাটকে ঘটনার তাড়া থাকে না — নৃত্য ও সঙ্গীতের ব্যাপক প্রয়োগে নাটক হয়ে ওঠে মঞ্চের অলঙ্কার। (সেলিম, ২০০৬ : ৩৩৫)

মধ্যযুগের কাহিনি-কাব্যগুলো আদতে বাংলার নিজস্ব নাট্যরীতিতে রচিত এক প্রকার নাটকই বটে, যেখানে অ্যারিস্টটলের সংজ্ঞা সম্পূর্ণ কার্যকর নয়। এগুলো ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে বর্ণনাকেও অর্থাৎ মহাকাব্য বা উপন্যাসের শিল্পরীতিকেও ধারণ করেছে। *কিত্তনখোলা* সেলিম আল দীনের ইউরোপীয় নাট্যরীতির বাহিরে গিয়ে দেশীয় নাট্যরীতিতে — যে রীতি 'আধুনিকতা' শুরুর সঙ্গে সঙ্গে প্রায় বিসর্জিত হয়েছে — রচিত নাটক। এখানে নাট্যকার নাটকের মধ্যে মহাকাব্য বা উপন্যাসের মতোই হাজির থেকে বর্ণনাকারী হিসেবে ঘটনাকে বর্ণনা করেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন এবং একই সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। এই বর্ণনা কেবল নাট্যকার নিজেই করেছেন তা নয়; চরিত্ররাও উপন্যাসের মতোই নাট্যকারের হয়ে বর্ণনায় অংশগ্রহণ করেছে। শুধু নাট্যকার আর চরিত্ররা বর্ণনায় অংশগ্রহণ করেছে তা নয়, *কিত্তনখোলা* নাটকের বিষয় এবং কাহিনির বয়নভঙ্গি, এমনকি স্বয়ং কহিনিটিও যতটা বর্ণনাত্মক ততটা ক্রিয়াত্মক নয়। *কিত্তনখোলা* নাটকের কাহিনিটি তিন, চার বা পাঁচ দিনের সংক্ষিপ্ত পরিসরে যে মেলা হয়েছে, সেই সংক্ষিপ্ত সময় পরিসরের মধ্যে শুরু এবং শেষ হয়েছে। অথচ এ নাটকের কাহিনিটি পাঁচ দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। তার ব্যাপ্তি ত্রিকালসঞ্চারী। সুদূর অতীত, বিশাল বর্তমান আর অসীম ভবিষ্যতের মধ্যে নাটকটির কাহিনির শিকড়-বাকড় সঞ্চারিত। দেবী মনসার জীবনবৃত্তান্ত, তার যন্ত্রণা, লাউয়া সম্প্রদায়ের জন্মোৎসব, বর্তমান সংকট এবং প্রতিটি চরিত্রের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের আলেখ্য বর্ণিত হয়েছে নাটকটিতে। চেতনা এবং কাহিনি স্বয়ং বর্ণনাত্মক হওয়ায় নাট্যকার নাটকটিতে বাংলা নাটকের নিজস্ব মূল বৈশিষ্ট্যের — বর্ণনাত্মক রীতির — পিঠে সওয়ার হয়েছেন। নির্দ্বিধায় তিনি অগ্রাহ্য করেছেন পাশ্চাত্য নাট্যরীতিকে। স্পষ্টভাবেই বলেছেন — '*কিত্তনখোলায়* বর্ণনাত্মক ভঙ্গি আমরা উৎস থেকে গ্রহণ করেছি।' (সেলিম, ২০০৬ : ৩৩৫) এর ফল হিসেবে আমরা দেখলাম, এই নাটকটিতে এসে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল উপনিবেশের হাত ধরে আসা পশ্চিমি নাট্যতত্ত্ব এবং নাট্যাঙ্গিক। সেলিম আল দীন উপনিবেশ-বিরোধী দেশজ নাট্যধারার মৌলিক নাট্যকার।

ইউরোপীয় ধারার প্রথাগত নাটকে চরিত্র-সংখ্যা এবং ঘটনার সংখ্যা থাকে কম। এতে করে নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক চরিত্রের মাধ্যমে নানা নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত দেখানো সহজ হয়। নাট্যকারের নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে ঘটনা কাঙ্ক্ষিত পরিণতি লাভ করে সহজেই। এছাড়া এতে করে নাটকের জন্য জরুরি ত্রি-ঐক্য — ঘটনা, সময় আর স্থানের

ঐক্য — রক্ষা করাও সহজ হয়ে ওঠে। কিন্তু *কিত্তনখোলা* নাটকের দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে, এখানে চরিত্র এবং ঘটনার যেন মিছিল। নাট্যকার যাকে বলেছেন, 'অজস্র অবিভাজ্য ঘটনাস্রোত'। এই 'অজস্র ঘটনাস্রোত নাটকটিকে পাশ্চাত্য নাট্যরীতির বিপরীতে দাঁড় করিয়েছে এবং নিয়ে এসেছে মঙ্গলকাব্য বা মধ্যযুগের কাহিনিকাব্যগুলোর ঘটনা সংঘটন রীতি যা বাংলা নাটকের আদি উৎস। এই অজস্র ঘটনার সমাবেশের কারণে *কিত্তনখোলা* নাটকের ঘটনাস্থল মেলা যেন হয়ে উঠেছে এক 'কার্নিভাল'। 'কার্নিভাল প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্ব খর্ব করে বিকল্পের সন্ধান দেয়।' (সম্রাট, ২০১০ : ২৭) *কিত্তনখোলা* নাটকে নাট্যকার মূল ধারার চেতনার মানুষের সমাবেশ না ঘটিয়ে, প্রথাগত প্রতিষ্ঠানবিরোধী, আপাত অনিয়ন্ত্রিত মানুষের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। ফল হয়েছে এই, চরিত্রগুলো নাট্যকারের ঐশ্বরিক ক্ষমতার প্রভাব থেকে অনেকটাই মুক্ত থেকেছে। চরিত্রগুলো লেখকের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে 'অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস' দেখিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আচরণ-উচ্চারণ আর ভাবনার যে কেন্দ্রীয় বা মান রূপ, তাকে ভেঙে দিয়ে জীবন জগৎ সম্পর্কে 'প্রান্তিক' ভাবনাগুলোকে সামনে নিয়ে এসেছে। যেকোনো মান (Standard) কাঠামো অসংখ্য 'প্রান্তিক' অমান ভাবনা এবং যাপন পদ্ধতিকে চাপা দিয়ে রাখে এবং নানা বিদ্যমান বিকল্পকে আড়াল করে রাখে। *কিত্তনখোলা* নাটকের কাঠামো এবং চরিত্রায়ণ 'মান' রূপকে মান্য না করায় আমরা চাপা-থাকা, অগ্রাহ্য হওয়া বহুস্বরের জীবন-জগৎ ভাবনা, তাদের সংকট আর বাস্তবতার এক জীবন্ত রূপের সন্ধান পাই। বাখতিন তাঁর উপন্যাসতত্ত্বে 'কার্নিভাল' সম্পর্কিত যে তত্ত্বের কথা বলেন, তা *কিত্তনখোলা* নাটকে দেখা যায়; যেখানে অকথিত জীবন ও ভাবনা তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছে। এদিক বিচারে *কিত্তনখোলা* নাট্য ছদ্মবেশে যেন এক 'কার্নিভাল' উপন্যাস; যার মধ্যে কোথাও অপ্রত্যাশিত ভেঙে পড়ার হুড়মুড় শব্দ, কোথাও অভাবিত, অপ্রত্যাশিত, অনিয়ন্ত্রিত ঘটনার ঘনঘটা; নাট্যকার যেন শুধু দর্শক।

ইউরোপীয় নাট্যতত্ত্ব অনুযায়ী, বিস্তার, ব্যাপকতা আর শোষণ ক্ষমতার প্রশ্নে সাহিত্যের অন্য অনেক শাখার চেয়ে নাটক নিঃসন্দেহে বেশ খানিকটা সীমাবদ্ধ শাখা। অন্তত মহাকাব্যের তুলনায় তো বটেই। কারণ নাট্যকারকে মঞ্চ নামক এক সীমাবদ্ধ আয়তনের স্থানের কথা সবসময়ই মনে রেখে নাটকের ঘটনা সাজাতে ও ঘটাতে হয়। চরিত্রদের সেই মঞ্চে আগমন-নির্গমনের পথটিও তাকে মাথায় রাখতেই হয়। নির্দিষ্ট আয়তনের একটা মঞ্চে চরিত্র-সংখ্যার স্বল্পতা বিবেচনা রাখাও নাট্যকারের সীমাবদ্ধতার আরেকটি কারণ। এছাড়া সময়ের নির্দিষ্টতা এবং বিচিত্র ঐক্যের দিকে লক্ষ রাখা — দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আধুনিক নাট্যধারায় যতই স্থান ও কালের ঐক্য অস্বীকার করা হোক না কেন — নাটককে এবং নাট্যকারকে নিঃসন্দেহে সীমাবদ্ধতার মধ্যে ফেলে দেয়। কিন্তু *কিত্তনখোলা* নাটকে সেলিম আল দীন নাটকের উপর্যুক্ত প্রথাগত সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার সাধ্য-সাধনা করেছেন। এমনকি তিনি নাটককে বিশুদ্ধ সংস্কারের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে এর শিল্পরূপ এবং আঙ্গিকের মধ্যে অন্যান্য শিল্পের বৈশিষ্ট্য শুষে নেওয়ার পক্ষপাতী। তিনি নাটককে 'নাটকের চেয়ে বেশি কিছু' বলে দেখতে চেয়েছেন *কিত্তনখোলায়*। তিনি নিজে বলেছেন —

> *কিত্তনখোলা* ও নতুন নাটক *কেরামতমঙ্গল* লেখার সময় নাটককে আমার কাছে নাটকের চেয়ে বেশি কিছু বলে মনে হয়েছে। আমাদের নাটক লিখিয়েদের উচিত নাটকের সঙ্গে অন্যান্য শিল্প মাধ্যমের দ্বৈতাদ্বৈত সম্পর্কটি বুঝে নেয়া। রবীন্দ্রনাথের পর্বত তো বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ হতে চায়। নাটকের আঙ্গিক চেতনা সংকীর্ণ হলে এ মাধ্যমে মানুষ ভাস্কর্যের আনন্দ আর সঙ্গীতের দ্যোতনা পাবে না। (সেলিম, ২০০৬ : ৩৩৬)

নাটকের আঙ্গিক, শিল্পচারিত্র্য নিয়ে সেলিম আল দীনের 'দ্বৈতাদ্বৈত' তত্ত্বটি নিঃসন্দেহে বিশ্ব নাটকের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী আধুনিক ভাবনা। 'দ্বৈতাদ্বৈত' তত্ত্ব নাটককে সাহিত্যের অন্যান্য শাখার নিকটবর্তী করেছে কিন্তু নাটকের নিজস্ব ব্যক্তিত্বও অটুট রেখেছে। বৈষ্ণব দ্বৈতাদ্বৈতবাদে কৃষ্ণ যেমন পরমাত্মা এবং অগুনতি সৃষ্টি রাধা জীবাত্মা, ঠিক তেমনি সেলিম আল দীনের দ্বৈতাদ্বৈত তত্ত্বে পরম হচ্ছে নাটক এবং অন্যান্য সাহিত্য শাখা যেন জীব। পরমের সঙ্গে জীবের যেমন লীলার সম্পর্ক, তেমনি নাটকের মধ্যে লীলায়িত হবে অন্যান্য শিল্পবৈশিষ্ট্য। এদের পারস্পরিক সম্পর্ক হবে দ্বৈত। আবার এরা এমনভাবে মিলেমিশে একাকার হবে যে, এদের মনে হবে অদ্বৈত। *কিত্তনখোলা* নাটকে সেলিম আল দীন নাটক এবং অন্যান্য সাহিত্য শাখার সঙ্গে দ্বৈতাদ্বৈত সম্পর্কটি স্থাপন করে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছেন। এই কাজ লক্ষ করা যায়, তাঁর নাটকের বিশাল ক্যানভাস ধারণে, ত্রিকালসঞ্চারী দৃষ্টিক্ষেপে, অগুনতি চরিত্রের সমাবেশে, ভাবের মাহাত্ম্যে, বর্ণনাত্মক রীতির আত্তীকরণে। এসবই *কিত্তনখোলা* নাটকটিকে মহাকাব্য এবং উপন্যাসের খুব কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছে তা নয়, বরং মহাকাব্য এবং উপন্যাস এসে মাথা ঠুকে মরেছে *কিত্তনখোলা* নাটকের দরজায়। নাটকটিতে নাটকের সঙ্গে সংগীত, উপন্যাস ও মহাকাব্যের দ্বৈতাদ্বৈত লীলাময় সম্পর্কটি অস্পষ্ট থাকেনি। নাট্যকার নিজেও *কিত্তনখোলা* নাটকে দ্বৈতাদ্বৈত তত্ত্ব ক্রিয়াশীল রাখা সম্পর্কে বলেছেন —

> শুরুতেই আমাদের মনে হয়েছিল যে এ বিষয়টি নিয়ে বাংলা নাটকের চলতি আঙ্গিকে নাটক রচনা করা সম্ভব নয় — বরং এ বিষয়টি অনেকাংশে মাহকাব্যের। এমনকি এ নিয়ে একটি উপন্যাসও রচনা করা যায়। সুতরাং স্বভাবতই চাইলাম যে ঐসব বিভিন্ন আঙ্গিকের বিস্তৃততর পটভূমিসমূহ 'কিত্তনখোলা' নাটকের কাজে লাগাতে। (সেলিম, ২০০৬ : ৩৩৩)

কিত্তনখোলা নাটকের মধ্যে নাট্যকার অন্যান্য সাহিত্যশাখাসহ উপন্যাসের সদগুণগুলোকে শুষে নিয়েছেন। বর্ণনা, বিস্তার আর উপন্যাসের মতো অগুনতি চরিত্রের — '৬০/৭০টি' — সমাবেশে তিনি নাটকটির মধ্যে উপন্যাসের আঙ্গিকগত তোলপাড় সৃষ্টি করেছেন। উপন্যাসের আঙ্গিক নিয়েও তো রয়েছে বিতর্ক ও মতভেদ। তিনি কি তবে ইউরোপীয় আঙ্গিকের উপন্যাসকে আত্মস্থ করেছেন *কিত্তনখোলা*, *কেরামতমঙ্গল*-এর মতো নাটকগুলোতে? এ বিষয়ে সেলিম আল দীন ছিলেন সম্পূর্ণ সচেতন। তিনি উপন্যাস বলার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব আলোচনাতেই মঙ্গলকাব্য কথাটির ব্যবহার করেছেন। তিনি সচেতনভাবেই *'কিত্তনখোলা* নাটকের উপাখ্যান রীতিটা মঙ্গলকাব্য রীতি থেকে গ্রহণ' করেছেন। (সেলিম, ২০০৬ : ৩৬৬)

বাংলা অঞ্চল ঔপনিবেশিক যুগে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে এর ভাষাও নানাভাবে উপনিবেশায়নের শিকার হয়েছে। ভাষার শব্দভাণ্ডার থেকে শুরু করে এর বাক্য গঠনরীতি ব্যাপকভাবে সংস্কৃতায়ন ও ইংরেজিকৃত হয়েছে। ইংরেজির আদর্শে আর সংস্কৃতের ছাঁচে বাংলা গদ্যকে ঢেলে সাজানো হয়েছে সমগ্র ঔপনিবেশিক আমলে। (আজম, ২০১৪ : ১৬৫)

কিত্তনখোলা নাটকের ভাষা উপনিবেশায়নের শিকার বাংলা গদ্যের কাঠামো থেকে বেরিয়ে এসেছে। সেলিম আল দীন এই নাটকের ভাষাভঙ্গি স্থির করার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার নিজস্ব টোন এবং চলনভঙ্গির প্রতি ছিলেন নিষ্ঠ। নাটকের ভাষার মধ্যে রয়েছে এক ধরনের গীতিসুর। আর এর চলনভঙ্গিটি মধ্যযুগের পয়ারের চলনভঙ্গির অনুরূপ: গদ্য আবার ছন্দোময়। *কিত্তনখোলা* নাটকের ভাষার উৎসপ্রমুখতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে নাট্যকার বলেছেন —

> বাংলা পয়ার ছন্দের সঙ্গে গদ্যের বিরোধ নেই। সমগ্র মধ্যযুগে গদ্যের ব্যাপক প্রচলন হয়নি এ কারণে যে সেকালে বাংলা পয়ার ছিল গদ্যের পরিপূরক ভঙ্গি। বাংলা গদ্যে স্বভাবতই মাত্রা আছে ছন্দ আছে। এক নিঃশ্বাসে কথা বললেই বাংলা গদ্য পেয়ে যায় ছন্দোরূপ। *কিত্তনখোলা*র ভাষা নির্মাণের সময়ে আমরা বাংলা গদ্যের উৎস ও বিবর্তন বিষয়ে সচেতন ছিলাম। (সেলিম, ২০০৬ : ৩৩৭)

আঙ্গিক এবং নাট্যরীতির প্রশ্নে *কিত্তনখোলা* সমগ্র বাংলা নাটকের ইতিহাসে এক পালাবদলের স্বাক্ষর। এ নাটকের মাধ্যমে সেলিম আল দীন বাংলা নাটকের সীমা এবং সম্ভাবনাকে যেমন বাড়িয়ে তুলেছেন, তেমনি এই নাটকের মাধ্যমে তিনি বাংলা নাটককে তার নিজের ঘরে প্রতিস্থাপন করার শক্তি সামর্থ্য সাহস এবং কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। উপনিবেশের হাত ধরে আসা নাট্যতত্ত্ব এবং নাট্যাঙ্গিকের ফলে বাংলা নাটকের ধারাবাহিকতায় যে ছেদ ঘটেছিল, সেই ছেদ সেলিম আল দীন পুনরায় জোড়া লাগানোর সাধনা করেছেন এবং বলা বাহুল্য তাতে সফলও হয়েছেন। দৃশ্য বিভাজন, মঞ্চ পরিকল্পনা, চরিত্র সমাবেশ, আখ্যান বর্ণনা এবং ভাষার প্রশ্নে *কিত্তনখোলা* একটি উৎসপ্রবণ নাটক। উৎসপ্রবণ বলতে বোঝানো হয়েছে দেশজ নাট্যরীতির প্রতি আনুগত্য। সেলিম আল দীন শুধু *কিত্তনখোলা* নয়, তাঁর অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ নাটকে আঙ্গিকের প্রশ্নে ইউরোপীয় প্রচলিত রীতির নাটকের মুখোমুখি দাঁড়াতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে তার অবলম্বন ছিল মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য, সাবারিদ খান, বিদ্যাসুন্দর, *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, পাঁচালি, যাত্রা আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এসব দিয়েই তিনি 'ইউরোপীয় নাট্যরীতির উল্টা পথযাত্রা'য় সফলকাম হয়েছেন।

গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

অজিতকুমার ঘোষ (২০০৫)। *বাংলা নাটকের ইতিহাস*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

কবীর চৌধুরী (১৯৮৮)। 'বাংলাদেশের নাটক', *বাংলাদেশের সাহিত্য* [সম্পা.সঙ্কলন উপবিভাগ], বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মোহাম্মদ আজম (২০১৪)। *বাংলা ভাষার উপনিবেশায়ন ও রবীন্দ্রনাথ*, আদর্শ, ঢাকা।

লুৎফর রহমান (২০১২)। *বাংলা নাটক ও সেলিম আল দীনের নাটক*, নান্দনিক, ঢাকা।

সম্রাট দত্ত (২০১০)। *বিশ শতকের আখ্যানতত্ত্বের প্রেক্ষিতে বাংলা উপন্যাস*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

সুকুমার সেন (১৪০১)। *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, তৃতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

সেলিম আল দীন (২০০৬)। *সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

সোহেল হাসান গালিব ও নওশাদ জামিল (২০১০)। *কহন কথা*, তৃতীয় সংস্করণ, শুদ্ধস্বর, ঢাকা।